Mohor Pasha

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

মোহর পাশা

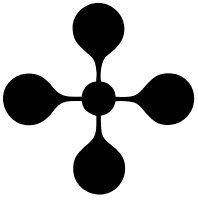

গার্গী ভট্টাচার্য

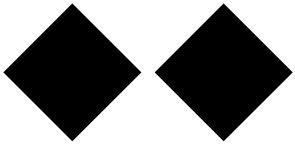

বালু,গুলু,সঞ্চিতাকে

মোহর পাশা

সবুজের দেশ মেহেন্দিগড় বা লোকাল লোকের গুড়ি । চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে আঁকার রং-য়ের বাইরেও এত সবুজ আছে । সবুজের হরেক রকমের শেড্ আর নয়ন জুড়ানো মিষ্টত্ব ও আভা । সেই আভায় **দিল্-খুশ্** হয়ে যায় । সবুজ দেখলে যে সত্যি সত্যি চোখের আরাম হয় তা এই রাজ্যে না এলে বোঝা যায়না । টিভি , কম্পিউটার, মোবাইল আর নানান বৈদ্যুতিক যন্ত্রের স্ক্রীন আমাদের সারাটাদিন মোহিত করে । এমন সময় হঠাৎ করে নির্ভেজাল সবুজ দেখলে আনন্দ তো হবেই হবে !!! বিশেষ করে গ্রামের রাস্তার দুই পাশে অসংখ্য সবুজের মেলা । বড় বড় গাছ , নারকেল গাছ, বুনো গাছ সবই আছে । আর গাঢ় সবুজ সবকিছু । পথ খুব চওড়া নয় কিন্তু দুই পাশের বৃক্ষগুলি নুয়ে পড়েছে রাস্তার ওপরে । দেখতে খুব ভালোলাগে ।

আর আছে অজস্র নদনদীর খেলা । সমুদ্র । এমন এক একটা নদী আছে যা বেয়ে, গরমের সময় সমুদ্রের নোনা জল এসে হাজির হয় । ফেনায় ফেনায় ঢেকে যায় চরাচর । পরে বর্ষায় আবার নুনবিহীন, বৃষ্টির মিঠে জলে ভরে ওঠে প্রান্তর । চাষীরা দুই ধরণের জলেই অভ্যস্ত । অসংখ্য খালবিল ও নদীর মাঝে এই সবুজ গ্রামগুলি এক দেখার মতন জিনিস । তাই বহু পর্যটক এখানে আসে । নিয়মিত । সমুদ্র,সবুজ জগৎ আর শান্তির খোঁজে ।

এখানে মূলত তিন ধরণের কাজ করে জীবন কাটায় লোকে । প্রথমতঃ চাষবাস করা , দ্বিতীয়তঃ হাউজ বোট চালানো ও মাছ ধরা আর তিন নম্বর হলো ছাতা তৈরি করা । এখানে ছাতাতে, সেলাই করে নক্‌শা করা হয় । তারপর সেইসব সিন্থেটিক্‌ কাপড়ে মোটা তার জুড়ে নিয়ে ছাতার আকার দেওয়া হয় । কুটির শিল্প ; আর বেশিরভাগ কর্মীই গৃহবধূ । রান্নাবান্না সেরে তারা এই কাজে নামে । ছাতার মধ্যে যে নক্‌শা করা হয় তাও অভিনব । পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে সেইসব সেলাই করা হয় । রামলীলা, মহাভরত,শ্রীকৃষ্ণের জীবনী এইসব । গ্রামীণ বধূরা বংশপরম্পরায় এই কাজ করে চলে । এখানে মেয়েরা কেউ মাছ ধরতে যায়না । **আর বিধবার সব নিয়ম মেনে চলা অথবা কুমারী মেয়ের**

কুমারীত্ব রক্ষা করা এইসব জিনিস কঠোর ভাবে মেনে চলা হয়। একটু রক্ষণশীল সমাজ আরকি !

এখান একটা সুবিশাল রিসর্ট বানানোর প্ল্যান করে এক ট্যুরিজম্ কোম্পানি । তাই ট্যুরিজ্‌ম্ ম্যানেজার মোহর বক্সীকে এখানে পাঠানো হয় সব দেখেশুনে একটা সলিড্ প্ল্যান ছকে ফেলার জন্যে ।

কিন্তু মোহর বক্সী ; এই জায়গায় পৌঁছে এখানকার সবুজাভা আর সরল মানুষগুলি দ্বারা মোহিত হয়ে সব ভেস্তে দেবার প্ল্যান করে । পরে ওর রিপোর্ট যা আদ্যপান্ত ভুলে ভরা, পেয়েই ওর কোম্পানি এখানে জমির ওপরে রিসর্ট না করে সমুদ্রের ওপরে বাতাসে, এক অপূর্ব নব প্রযুক্তির রিসর্ট তৈরি করে । মোহর যা রিপোর্ট দিয়েছিলো তাতে ক্ষয়ের কথা ছিলো, ব্ল্যালেন্সশীটে লসের কথা ছিলো আর ছিলো নানান ধরণের শাপ শাপান্ত , বাপ্ বাপান্তের ইঙ্গিত । তাই ওর ভ্রমণ সংস্থা, ওখানে লোকাল লোকেদের বিরক্ত না করে এক অভিনব মহল গড়ে তোলে যা সাগরের ওপরে ভাসমান, অনেকটা হাওড়া ব্রিজের মতন । মোটা মোটা পিলারের ওপরে এই রিসর্ট-এ যেতে হলে অত্যাধুনিক এক সরু ব্রিজের ওপর দিয়ে যেতে হবে যা দেখলে মনে হবে তা বাতাসে ভাসছে । ব্রিজটি এমন

বস্তু দিয়ে তৈরি যে ওটা জলে ডোবে না বটেই কিন্তু ওর ওপরে পা দিলেই দুলতে শুরু করে । সেই নাগরদোলায় চেপেই লোকে রিসর্ট-এ যায় । আর রাতদিন কাটায় এক ভাসমান জাহাজের মানে ক্রুজের মতন হোটেলে যেখানে নকল বাগান আছে আর আছে ছোট্ট হেলিপ্যাডও । লোকাল অনেক মানুষ ওখানে কাজও পেয়েছে । সবই মোহরের কল্যাণে । ও ট্যুরিস্ট সংস্থার, **পাশার চাল বদলে দিয়েছে ।** সরল মানুষগুলিকে আর সর্বহারা হতে হয়নি । ওরাও যুগের সাথে পা মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়েছে আর ওদের সবুজ সবুজ আঙিনা যা মেহেন্দিগড়ের বৈশিষ্ট্য তাও ধূসর মরুতে বদলে যায়নি । আজও লোকে ওখানে সবুজের সন্ধানে যায় আর পায়ও । মেঠোপথে, নারকেল আর গুলমোহর গাছের রূপে আর ভাঙাচোরা মানুষগুলির আআয় ।

এইসব মানুষের, নানান কাহিনী মোহর শুনেছে আর দেখেছে যা এখানে লিপিবদ্ধ করা হল । এক একটি গল্প এক একটি ছোট গল্প, সাহিত্য পন্ডিতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে । কিন্তু মানুষের সাইড থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এগুলি জীবন্ত কাহিনী, রামধনু রং -এ চোবানো আর নীল জোছনায় ডোবানো ।

বৈধব্য

বুড়ি কনকাম্মার ; বৈধব্যের বয়স অনেক । যুবতী থাকার সময় স্বামীকে হারায় । ঘরে তিন তিনখানা বাচ্চা । কনকাম্মা বৈধব্যের সমস্ত রীতিনীতি মেনেই চলতো কিন্তু উনুন জ্বালানো দায় । চাষের কাজ সবসময় থাকতো না । বেশিদূর যেতে পারতো না গাড়ি চড়ে, কাজের আশায়-- কারণ পয়সা ছিলো না ।শিশুগুলো অভুক্ত থাকতো । কনকাম্মার শেষ পর্যন্ত চৈতন্য হল বুঝি । এলাকার অনেক পুরুষ সংসার চালানোর জন্য মাছ ধরতে যেতো গভীর সমুদ্রে ।

বেশ কয়েক মাস তারা ঘরে ফিরতো না । দূরে বিকিকিনি করে আসতো । অনেকে লোকাল নদীতে । ওদের দলের সাথে ভিড়ে গিয়েই একদিন সেও মেছো হয়ে গেলো ।

যেই দেশে বিধবার, মাছের আঁশ স্পর্শ করা পর্যন্ত বারণ সেখানেই নিয়মিত মৎস্যকন্যা হতে শুরু করলো কনকাম্মা । সমাজ তাকে একঘরে করলো । কিন্তু শিশুদের মুখ চেয়ে, এই যৌবনে বিধবা হওয়া নারী এক মনে মাছ ধরে যেতে লাগলো । মোহর শুনেছে যে আঁশটে গন্ধতে ওর কষ্ট হয় । কারণ নিজে মাছ খায়না অনেকদিন হল- তবুও নাক চেপে ওকে এই কাজ করে যেতে হয় কিছু নবীন চেতনার প্রাণ রক্ষার জন্যই ।

কনকাম্মা , রোজ রাতে ভালো করে স্নান করে, খোঁপায় একটা জুঁই ফুলের মালা লাগায় । আঁশটে গন্ধ দূর করার জন্য । তবে তা করে ঘরের এক কোণায় ঢুকে যাতে বাইরের কেউ টের না পায় । কারণ এই এলাকায়, বিধবার যে ফুল দিয়ে সাজাও বারণ !

কারুবকি

কারুবকির বাস এই সবুজাভাতেই । ও একজন যুবক যার কাজ বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এক অদ্ভুত দেবত্ব জাহির করা । ও নিজের মাকে নিয়ে থাকে । বিয়ে শাদি হয়নি । কারণ লোকে বলে --কোন মেয়ে একে বিয়ে করবে ? এর সারাটা দেহে ফুটো ফুটো ; ছিদ্রর কারুকার্য !

সত্যি তাই বটে ! কারুবকির কাজ হল নিজের গায়ে লোহার মস্ত মস্ত সমস্ত শিক্ বা রড গেঁথে নিয়ে খুব উঁচুতে উঠে বন্‌বন্ করে ঘোরা । এইগুলো ওরা ওদের একধরণের উৎসবের সময় করে । যখন শিক্ গাঁথা হয় তখন নাকি সে টেরও পায়না । আবার রক্ত বার হওয়া কিংবা জখমে কোনো পচন ধরে যাওয়া এসব হতে কেউ কখনো দেখেনি । শতাব্দী ধরে চলে আসছে এই প্রথা ও পন্থায় ঝোলা তবুও কেউ এতে সেপ্‌টিক হয়ে

প্রাণ দিয়েছে সেরকম কোনো ঘটনা লিপিবদ্ধ নেই কোথাও । ইদানিং আধুনিক যুগ এসেছে বলে অনেকে এগুলো আর করেনা তবুও অনেকে আছে যারা নিয়মিত এসবে ভাগ নেয় । কারুবকি এমনই একজন । তার সারাটা দেহেই বড় বড় ছিদ্র । মুখে, পিঠে ও বুকে ! গালের একপাশ থেকে অন্যপাশে ইয়া বড় একটা রড্ ঢোকানো , কখনো পিঠে অসংখ্য লোহার শিক্ গাঁথা আবার কোনো কোনো সময় সে বুকে অজস্র শিকল ও শিক্ ঢুকিয়ে উঁচু পোস্টের সাথে নিজেকে ঝুলিয়ে বাই বাই করে ঘুরতে থাকে । সাধারণ মানুষের মাথা ঘুরে যাবার জন্য যথেষ্ট এগুলো । তবুও এরা বংশ পরম্পরায় এসব করে । ধার্মিক আর নীতিবাগিশ্ নয় একটু ম্যাচো দেখাবার জন্য । মেয়েরাও করে তবে এমন কাউকে মোহর দেখেনি আজও ।

কারুবকির, এসবের জন্য কোনো জীবনসাথী হবেনা কোনোদিনই তবুও কিসের আশায় ও নেশায় সে ছুটে চলেছে কেউ জানেনা ।

ওকে দেখলে দু:খ হবে ! সারাটা গা যেন কেউ ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে ফেলেছে । তবে রক্তক্ষরণ ও দূষণ নেই বলে হয়ত ঘা সারাবার ঝামেলা থেকে ও মুক্ত । তাই হয়ত প্রতিবার এক অদেখা আনন্দের টানে ছুটে ছুটে যায়, ঐ দেহলতাকে ক্ষতবিক্ষত করার

নেশায় । এক বান্ধবী ছিলো । নাম রাজসিকা । সেও এই এলাকার মেয়ে । তার আবার অন্য গল্প ! সে কারুবকি, ওকে বিয়ে করবে না বলে কারণ তার সারা দেহে ফুটো ফুটো , এক মোবাইল নিয়ে বিশ্ব-দরবারে নিজের কাহিনী মেলে ধরে । ভিডিও করে দেখায় লোককে ।

প্রতি সন্ধ্যায় সে নদীর ওপরে ঝুলে থাকা এক মরা বৃক্ষের মগডালে চড়ে বসে । সাঁতরে যায় সেখানে । গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত সব ঋতুতে যাওয়া চাই তার । সেখানে চড়ে বসে নাকি দেখে যে কাক বা চিল ওকে ঠুক্‌রে নেয় কিনা ! তাহলে হয়ত কারুবকি রাজিও হতে পারে । ও একবার আবদার করেছিলো যে নিজেও এরকম করে নিজের দেহে লোহা গাঁথবে । তাহলে ওদের মিলন হতে পারে । কিন্তু কারুবকি না করে দিয়েছে । বলেছে যে তুই পারবি না । এসব তোর কম্মো না ।

তাই রাজসিকা এখন, এইভাবে- বিকেলের মরা আলোয়, নদীর মাঝে ঐ গাছে চড়ে বসে হাতে কুচো মাছ নিয়ে ! যদি কোনো পক্ষী শকুন বা চিল ওকে দয়া করে ঠুক্‌রে যায় !

মোহরের ভীষণ অবাক লেগেছে এদের গল্প শুনে আর এদেরকে দেখে । যেহেতু কোনো জখম পচে না বা রক্ত

পড়ে না তাই কেউ মারা যায়না আর হয়ত তাই যুগ যুগান্ত ধরে এই সংস্কার চলে আসছে এদের মধ্যে । কেউ প্রতিবাদ করেনা বরং অনেক ভ্রামণিক আসে এসব দেখতে । মিরাকেল । বিশেষ করে ওয়েস্টের লোকে দলে দলে আসে। ভিডিও তোলে । কেউ আবার কারুবকির সাথে রাত কাটিয়ে যায় ওর জীবন জানার জন্য ।

গাঢ় সবুজের মধ্যে ওর বাস । এখানে ঘন সবুজাভার মধ্যে মাটি ও ব্যাড়ার বাড়িগুলি । নিঁখুত আকারের । বাদামী কিংবা মেরুন রং এর ছাদ আর ক্রিম অথবা হাল্কা খয়েরি দেওয়াল মানে মাটি বা ব্যাড়াগুলি । আমাদের ছোটবেলায়, আঁকার খাতায় আঁকা সেই ত্রিকোণ বাড়িগুলির মতন এইসমস্ত বাড়ি । শিল্পীর ক্যানভাসের মতন ফুটে উঠেছে, সবুজের বুকে !

চারপাশে ঘন নারকেল বন কিংবা অন্য কোনো সবুজ চাঁদনীর আনাগোনা । পিচের রাস্তা শুয়ে আছে বিশ্রামরত অজগরের মতন । এক স্বর্গীয় অনুভূতি হয় মোহরের এসব দেখলে । সে নিজে ছিলো অংকের ছাত্রী ! অংক থেকে অঙ্কনে -- বলেছিলো ওর প্রথম স্বামী দিবাকর । দিবাকরের পরিবারে কেউ ছিলোনা । বাবা ও মা অনেক আগেই গত হয়েছেন । দুই ভাই ও বিবাহিতা দিদিরা ছিলো । ভাইদের মধ্যে একজন নেভিতে ।

অন্যজন কেরানীগিরি করতো । তার বিয়েও দেয়নি বড় ভাই । ভদ্রলোক খুব জ্ঞানী আর সব কাজ করতে সক্ষম । সে জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ অবধি !

কিন্তু সংসার হলনা বৌমণির জ্বালায় । বিয়েই দিলোনা দাদা ! অতি কম বয়সে মারা যাবার সময় যা কিছু জমানো ছিলো সব দিয়ে যায় দিবাকরকে । দিবাকর তখন বিভিন্ন পীঠস্থানে গিয়ে গিয়ে থাকতো । সংসার থেকে এত আঘাত পেয়েছে যে সংসার ত্যাগ করে ফেলেছে । ভিক্ষা করে দিন কাটাতো । ৬ মাস বাংলায় আর বাকি ৬ মাস নানান ধর্মীয় স্থানে ঘাঁটি গাড়তো ।

অনেক সাধু দেখেছে সে । দেখেছে বকধার্মিকই বেশি ! কেউ কেউ সাইকিক পাওয়ারের জোরে অভিজাত সমাজে গিয়ে গুরু হয়ে বসেছে । কেউবা মিথ্যার মুখোশ পরে- লোককে আশীর্বাদ দেবার ছল করে অনেক কামিয়ে, প্রবাসে গিয়ে বিয়ে করে থিতু হয়েছে । ভন্ডামি দেখে দেখে সরে এসেছে এবং পরবর্ত্তী জীবনে এক অভিনেতার বাড়িতে চাকরের কাজ করে করে লেখাপড়া শিখেছে । ডাকযোগে সব কোর্স করে । কিন্তু ভাগ্যের আজব খেলা ! এই শিক্ষার জোরেই তাকে এক ব্যবসায়ী তার প্রাইভেট কলেজে শিক্ষকের কাজে

নিযুক্ত করে । আর পরে **অল ইন্ডিয়া চার্টার্ড হিসেবরক্ষক ইন্সটিটিউটের** পরীক্ষাতে সে থার্ড হয় ।

এইভাবেই আলাপ হয় এক স্বর্ণালী সন্ধ্যায় , মোহরের সাথে । চেনা গন্ডীর বাইরে, অচেনা এক মানুষ ! মোহর মুগ্ধ না হয়ে পারেনা । পরে বিয়েও হয় কিন্তু কোনো মানুষই তো পার্ফেক্ট নয় ! তাই এত সংগ্রামের জীবন যার- তারও পদস্খলন হল ! মোহর সরে আসে । প্রথমে অনেক বোঝায় কিন্তু পরে সরে যেতেই হয় । হয়ত একদিন বুঝবে , অনুশোচনাও হবে কিন্তু তখন আর করে ফেলা কাজ ডিলিট করা যাবেনা কারণ জীবন তো আর কম্পিউটার স্ক্রিন নয় !

তবুও সময় থাকতে বোঝেনি । এক মারোয়াড়ির ব্যবসায় কাজ নিয়েছিলো পরে । শিক্ষকতা থেকে সরে গিয়ে ; কারণ ওদিকে পয়সা নেই । হয়ত শিক্ষক হয়ে থাকলে এই বিপদে পড়তে হতনা ! এখন কারাগারের ওদিকে তার বাস । তবে বিচ্ছেদ আগেই হয়ে যায় মোহরের সাথে । ততদিনে সেও অংক ছেড়ে, অঙ্কন ছেড়ে- ট্র্যাভেল সংস্থায় ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিয়েছে ।

মাস্টার্স অফ্ ট্র্যাভেল অ্যান্ড টুরিজম্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান করেছে ভালোবেসেই । অবসরে হায়ার সেকেন্ডারি, বিএ- অংক অনার্স ইত্যাদির ছাত্র পড়িয়েছে মগজকে সাফ রাখতে । ওর একটা স্বপ্ন আছে । আইনস্টাইনের বাড়িতে যাবার । এটা ওরা

ক্লায়েন্টদের শুধায় যে ড্রিম ডেস্টিনেশান কী ? ওর নিজের স্বপ সিঁড়ি গিয়ে পৌঁছাবে ---- 112 Mercer Street in Princeton, Mercer County, New Jersey, United States ---!!!

হয়ত কোনোদিন সুযোগ পাবে ওর গুরুকে অলৌকিক চোখে দেখার । ওর গুরু হলেন আইনস্টাইন ।

আইনস্টাইনের ছবি আছে ওর কাছে । ও নিয়ম করে ফুলমালা চড়ায় । লোকে যেমন রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে সেরকম ও করে আইনস্টাইন জয়ন্তী ! অংক ওর খুব ভালোলাগে । তবুও ভ্রমণের দিকে এসেছে কারণ বেড়াতেও ও খুব ভালোবাসে । কিছুদিন হয়ত এই কাজ করবে আর পরে অংক টিচার হয়ে কোনো রিমোট এরিয়ায় চলে যাবে । আজকাল তো কত **এনজিও** আছে । তারা এরকম তুখোর মাস্টার চায় আর পয়সাও দেয় । ওর চলে যাবে, ভদ্রস্থ আয় হলেই ! আর ট্যুর কোম্পানিকে ধরে অনেক অনেক বেড়িয়ে নেবে !

দিবাকর, টিচিং থেকে ব্যবসায় কাজ নেয় আর ও ঠিক তার উল্টো ! তবে ওর পদস্খলনের সম্ভবনা খুবই কম কারণ ওর মাথাটা একদম ঠিকঠাক চলে ,যাকে বলে **level-headed** আরকি !! আর আবার বিয়ে করবে ; তাই দিবাকরকে ও প্রথম স্বামী বলতেই পছন্দ করে ।

******

কারুবকির কান্ড দেখে দেখে, এক ভ্রমণ পাগল বিদেশী, আজকাল ওরকম করে- উঁচু বেদী থেকে দড়ি ঝুলিয়ে বন্‌বন্‌ করে ঘোরে । সম্প্রতি ফুটো করা আরম্ভ করেছে । নিজের জীবন নিয়ে, নিজেই নাকি তথ্যচিত্র তৈরি করছে । ওর নাকি বিদেশে- ইয়া বড় একটা জাহাজ আছে, যাতে চড়ে চড়ে ও তিমি নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করেছে ।

ফুটো করতে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে, কারণ অন্যরা একটা ভড়ের মধ্যে থাকে তখন কিন্তু ওর সেটা হয়নি- তাই । তবে টিটেনাস্‌ নিয়ে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই । তাই বিশেষ অসুবিধে হয়নি ।

এই সাহেব নাকি বাঞ্জি জাম্পিং করে অভ্যস্থ তাই ঐভাবে ঘোরাতে কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু ভড়টা নাহলে -লোহা ফোটানোর সময় ব্যাথা তো লাগবেই আর রক্তও বার হবে । পরে পচন ধরতে পারে । কাজেই ইদানিং ও ভড় হবার জন্য ধ্যান করছে । ঘটিবাটি বিক্রি করে এখানে এসেছে, এই তথ্যচিত্র বানাবার জন্য **যা নিজেকে নিয়েই ।**

এদের কথা জেনেই মোহরের কোম্পানি- এখানে সুবিশাল রিসর্ট বানাতে আগ্রহী ছিলো । কত মানুষের আনাগোনা এখানে । যখন নদীতে নর্মাল জল থাকে তখন অনেক লোক আসে, আবার যখন নদী শুকিয়ে

যায় আর নোনাজল, সাগর থেকে প্রবাহিত হয় তখন সেটা দেখতেও লোকে আসে দলে দলে ।

কাজেই এহল এক মস্ত ট্যুরিস্ট স্পট ! শুধু বাণিজ্য ফেঁদে বসার অপেক্ষা । এদের গ্রামে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা , লোকাল লোকের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করা ,

ওদের মতন খাবার খাওয়ার জন্য রেস্তোরাঁ বানানো, ওদের হস্তশিল্প শেখা , ওদের মতন ক্ষেতে গিয়ে ফসল তোলা শেখা এসব কিছুরই ব্যবস্থা করে দেবে ট্যুর কোম্পানি । শুধু ফেলো কড়ি আর মাখো বনজ তেল ! শুধু মোহরের একটা রিপোর্টের অপেক্ষা ।

মোহর, একধরণের সার্ভে করতে এসেছে । হয়ত কিছু তথ্য এমন পাবে ওর কোম্পানি যে অনেক নতুন নতুন জিনিস জানাতে পারবে আর সেইমতন কাজ শুরু করবে । বাইরে থেকে তো সব বোঝা সম্ভব না । ওখানে কিছুটা সময় কাটালে অনেক জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাবে । কোম্পানি, এত টাকা ইনভেস্ট করবে তার থেকে তো প্রফিট্ হতে হবে !

মোহরও কাজে নেমে পড়েছে । অনেকদিন হল সে এখানেই আছে । এদের দেখছে , জানছে , চিনছে ।

মানুষগুলি, জোছনা-ভেজা ও নিজস্বতাকে বজায় রাখার কঠোর ব্রত নিয়েছে কিন্তু অন্তরে ওরা ঠিক কেমন-

তাই জানতে চায় মোহর কেবল চাকরির কারণে নয় , ওদের দেখে একটা অদ্ভুত ইচ্ছে চাগিয়ে উঠেছে মনে ---সবাইকে জানার ও বোঝার ।

যখন জানতে পেরেছে কিছুটা- তখন বুঝেছে যে ওদের ভিটেমাটি কেড়ে নেবার কোনো অধিকার, ধনীদের জন্য নির্মিত ভ্রমণ মহলের নেই । তাই একেবারেই ভিন্ন রিপোর্ট দিয়েছে শেষে । সংস্থা, ওর রিপোর্টকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছে আর সেইকারণেই আকাশে গড়ে তুলেছে ভাসমান এক অত্যাধুনিক রিসর্ট ! যেখানে যেতে হয় মেঘে চড়ে ! আর এইসব সবুজ মানুষগুলি, নতুন জীবিকার সন্ধান পেয়েছে ঐ রিসর্টের হাত ধরে । মোহর কাউকে ঠকায়নি । ও ঠকাতে জানেনা । ও যে অংক করে । হিসেব মেলানো ওর কাজ । প্রবলেম সলভ্ করাই ওর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে । ও দিবাকরের মতন লোভে পড়ে, লাভের পাশা উল্টাতে শেখেনি । ও তো অংকের লোক ! হিসেবের লোক নয় । তাই ওর অভিধানে সবই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ! সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট বলে কোনো কনসেপ্ট নেই ।

রং রূপ আর রাত্রি

নারকেল বীথির পাশে থাকে কেথু । কেথু কিন্তু এক রমণী । নাকে তার ইয়া বড় এক নথ । ময়লা পোশাক আশাক । এক চিলতে ঘরে থাকে । সেই কুটির বলো যাকে ! বাইরে বসে বসে খায় । বৃষ্টি হলে ওপরে একটা ফলস্ ছাতা ঝুলিয়ে নেয় । তার নিচে খায় । বাইরে একটা খাট আছে । তাতে চাদর পেতে বসে খায় । হাঁটু মুড়ে বসে খায় । খাওয়া হলে খাট মুছে দেয় !

কেথু খুব পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করে যদিও সাবানের অভাবে রোজ জামাকাপড় ধুতে পারেনা, জলে ধোয় তাই ময়লার একটা পরত ওতে থেকেই যায় ।

তবুও খাবার পরে সব ধুয়ে দেয় । আর ওর বাসায় বিচিত্র রং এর সমস্ত কলসী আছে । সব প্লাস্টিকের কলসী ! এই এলাকায় লোকে রং বেরং এর প্লাস্টিক কলসীই ব্যবহার করে । লাল, নীল, সবুজ, মেটে, হলুদ, বেগুনি , কালো , সাদা আরো কত কি !

কেথুর বাসায় সব কলসীগুলো কোনো শিল্পীর রং এর প্যালেটের মতন সাজানো থাকে । যেন কালার বার এক একটা ! ঘর তো একচালা অথচ তারই সামনে ঐ কলসী গুলো সাজিয়ে রাখে আর দেখে মনে হবে যেন ওর আঙিনায় ফাগুন লেগেছে !

ফাগুন লেগেছে ওর গৃহকোণের হাটেবাটে ।

আর আজব কান্ড ! এই সাধারণ মেয়ের কালার সেন্স কোনো শিল্পীর থেকে কম নয় ! কোন রংয়ের কলসী কোনটার পাশে মানাবে ভালো সেটা সে জানে আর সেইভাবেই সাজানো আছে সেগুলো । মোহর দেখে মুগ্ধ হয় । কয়েকবার সে মজা করে উল্টে রেখেছিলো । একটু বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলে কেথু । বলে --উহ্ ! জিজি, এইভাবেই রাখেনা । বাজে দেখায় । এইভাবে রাখবে । বলে নিজেই আবার রং মিলিয়ে সাজিয়ে দিতো । গ্রামীণ গৃহকোণে, এক অপার্থিব হোলি খেলায় মেতেছে এই সরল মেয়ে । কোনোদিন ওর ছবি কেউ মিলিয়ন ডলারে কিনবে না জেনেও !

তবে ওর অন্য একটা কাজও আছে । ও কাজ করে কলার চিপ্স কারখানায় । এখানে অনেক কলা বন । কলাবৌ ওদের একজন দেবী । গনেশের সাথে ওরা কলবৌকে পুজো করে । আলাদা মন্দিরও আছে । সেই কলাকে চিপ্স করে ওরা বিকিকিনিও সারে । মোট

চার ধরণের কলার চিপ্‌স বানানো হয় এখানে । কলাকে ক্ষুদ্র অংশে কেটে নিয়ে হয় নারকেল তেলে ভাজা হয় অথবা সাধারণ তেলে ভেজে লাল লঙ্কা দিয়ে মশলাদার তৈরি করা হয় অথবা কোনোটাই না করে গোলমরিচ মশলা হিসেবে দিয়ে চিপ্‌স করা হয় কিংবা লম্বা লম্বা অংশ করে কেটে নিয়ে আবার কোনো না কোনো মশলা দিয়ে তৈরি করা হয় । বিদেশেও নাকি যায় এইসব কলার চিপ্‌স । খুবই লোকপ্রিয় । তবে লোকাল নেতারা ওগুলো রপ্তানি করে । নিজেদের কারখানা থেকে যা ওরা বৌয়ের নামে চালায় । বড় বড় ভেলায় ভেসে মানে বোটে করে সমুদ্র ঘেঁষে, এইসব কলার খেলাঘর চলে যায় ভিনদেশে অন্য স্বাদের মানুষের কাছে । এক এক প্যাকেট বিক্রি হয় অনেক ডলার কিংবা লিরাতে । তার কতটুকু অংশ এই কেথুরা পায় ? তাই বুঝি কেথুর খাবার ঘর হয়না ।

প্লাস্টিকের রঙীন কলস সাজিয়েই সুখী হবার বৃথা চেষ্টায় কেটে যায় জীবনটা তার । হা হুতাশ করেই যায় আর কিছু হয়না । রাত্রির যেন কোনো শেষ নেই , নেই ঊষার স্পর্শ ওর জগতে আর একদিন দেখা যায় মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে ! আর কিছু পাবার নেই । আশাও নেই

। তখন কেথু যেন থিতু হয় দু:খের সাগরে, অমানিশায় । মেনে নেয় ওর এই সীমাবদ্ধতা । তবুও প্রতিটি গাঢ় রাত্রি আসে রং মিলন্তি খেলায় ভেসে । কেবল প্লাস্টিকের কলস সাজিয়ে মনে রং লাগায় অবাঞ্ছিত কেথু , সমাজের অদেখা শৈল্পিক বস্তির রূপরেখায় ।

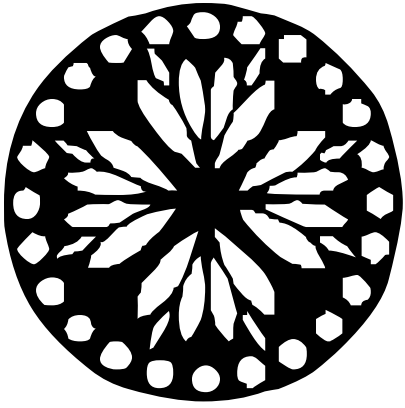

যমের দুয়ার

যমের মন্দির আছে এই এলাকায় । বহু পুরাতন এক মন্দির । অসম্ভব সুন্দর কিন্তু পরিত্যক্ত । গঠণ শৈলী দেখবার মতন । বিকেলের মরা আলোয় অথবা ভোরের লাল রং মেখে এই মন্দির হয়ে ওঠে সুবাসিত । এখানে একটি প্রদীপ শিখা জ্বলছে । বহ্নিশিখা বলা আরো ভালো । কে , কবে এই শিখা জ্বালায় কেউ জানেনা আর কোনো সময়ই এই শিখা নেভে না । আজব কান্ড!

কচি ঘাসের ঘ্রাণ অথবা শিশিরের শব্দ, কবির এইসব আবেদন গুলো স্পষ্ট দেখা যায় যমের দুয়ারে ! লোকেরা এখানে আসেনা । কখনো । কেবল বৃদ্ধা রোহিনী এখানে এসে পুজো করে । ও এখানেই স্থায়ী ভাবে বাস করে । মুখে বলে , আমার কোনো ভয় নেই যমরাজকে কারণ না আমি কোনো পাপ করেছি আর না আমার সেই বয়স আছে ! যত তাড়াতাড়ি চলে যাই তাতেই মঙ্গল !

রোহিনীর মেয়ে নেই । দুই ছেলে । তারা অন্য জায়গায় কাজ করে । মা নিজেই সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে ।

নিজের রোজগারে পিতৃহীন দুই বাচ্চাকে মানুষ করেছে । আগে ঝিং নামক এক ফলের বাগানে কাজ করতো । এই ফল, বড় কূলের সাইজের হয় । লাল টকটকে রং । গোল আর ঈষৎ চওড়া গড়ণ । গাছে যখন ফল ধরে তখন পুরো গাছ লালে লাল হয়ে যায় । অনেকটা কৃষ্ণচূড়ার মতন । পাকা ফল মাটিতে পড়ে যায় ।

ঝরে ঝরে । সবুজের ওপরে মায়া অরণ্যের সৃষ্টি করে, ফলের ঝাড় । পরে কুলিরা ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, ওর ভেতর থেকে একটা বিচির মতন বাদামী ও শক্ত জিনিস বার করে । তার গায়ে আবার সুন্দর নক্শা করা ! সেই ফলের বিচি খুব দামী । রাজকীয় সব ডিশে দিলে নাকি অতি সুস্বাদু হয় । তো রোহিনী সেই ফল কুড়াতো । এই ফল কুড়াতে গেলে হাতে এক জাতের রস লাগে, তার থেকে চামড়া কালো হয়ে যেতে পারে ।রোহিনীর দুই হাতই- আলকাত্রার মতন কালো রং এর । বলে , আমি যমের পুজো করবো না তো কে করবে ?

বাইরে ঘুরে এসেছে কাজের জন্য । অন্য প্রদেশে নাকি এক বাগানে কাজে গিয়েছিলো । ওখানে কুলিদের সাথে থাকতে হত । পুরুষ শ্রমিকেরা নানানভাব ওকে লোভ দেখাতো । **যেমন ময়ূর পেখম মেলে ধরে ময়ূরীকে ডাকে সেরকম আরকি !** কিন্তু রোহিনী একটু রক্ষণশীল

তাই পতি, মৃত হওয়া সত্ত্বেও সে আর বিয়ে করেনি । দুই ছেলেকে এই গ্রামে, নিজের মায়ের কাছে রেখে যায় । মাও এক স্বাধীন রমণী । একই ফলের বাগিচায় আগে কাজ করেছে । ওর বাবাকে নিয়ে থাকে এক নড়বড়ে বাসায় । মাটির দেওয়াল । বাদামী ও খয়েরি রং এর আর ওপরে টালি । নিকানো উঠোন । সেখানে আজও বসবাস করে ওর মা ! আর রোহিনী ; ঐ যম দুয়ারে । বলে , তোমার কম্মো তোমার কাছে ফিরে আসবে । যম কী করবেন ? ভয় পাও কেন ? মন্দ কাজ নাই বা করলে !

এই মন্দিরে সে থাকে তবে ফলমূল সব আসে বন থেকে । আনে ওর সহচর এক বাঁদর । সে ওর সাথে কোথা থেকে জুটে গেছে । সবসময় ওর সাথে থাকে ।

বন থেকে ফলমূল এনে রোহিনীকে দেয় । সেই দিয়েই সে নিত্য পুজো সারে- এক ভয়াল পুরীতে বসে ।

মন্দিরটি, যে কোনো শিল্পীর কাছে লোভনীয় এক কলার মতন । এত অপরূপ তার কারুকার্য আর রং যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায়না ।

রোহিনী যখন বাইরে কাজে গিয়েছিলো, তখন নাকি সে একবার সরকার থেকে একটি ট্রেনের বিশেষ পাস পেয়ে ভারতের অনেক জায়গা ঘুরে এসেছে । একা

একা । কিছুটা আবার পদব্রজেও গেছে । বলে -- দুনিয়া দেখা হয়ে গেছে আমার । আমার করা কাজ অথচ নাম নিয়ে নিলো অন্য পুরুষ ! মেয়েরা দূর্বল বলে ওরা যা ইচ্ছে করে । আমি তো আর হাতাহাতি করতে পারিনা , আমার **পেস্টিজে** লাগে ।

(এই ইংলিশ কথা- সে নাকি দুনিয়া দেখে শিখেছে !)

কাজ করে আরো অনেক টাকা আনতে পারতো কিন্তু পুরুষ কুলিরা ওকে সরিয়ে, নিজেদের নাম নিয়েছে বলে মালিক ওকে ঠকিয়েছে । তাছাড়া মেয়েরা মা হলে নাকি ঐ বাগিচা ওদেরকে তাড়িয়ে দেয় । বলে যে বাচ্চা হবে আবার দুগ্ধপানের নামে ছুটি নেবে বলবে আমরা এখন দূর্বল ইত্যাদি তাই ওদের ছাড়িয়েই দেয় । ভাগ্য ভালো যে রোহিনী আগেই এইসব পালা শেষ করে ওখানে গিয়েছিলো । তবে কর্মক্ষেত্রে সুখ না পেলেও সে বেড়িয়ে বড় আরাম পেয়েছে । তার তো দুনিয়া দেখা হয়ে গেছে ! মারাঠা প্রদেশে মেয়েরা কাছা দিয়ে শাড়ি পরে, গুজরাতে, একে অন্যকে ভাই ও বোন বলে, পাঞ্জাবীরা মাথায় গাম্ছা মানে পাগড়ি পরে , বিহারিরা খুব উজ্জ্বল পোশাক ও চুড়ি পরে এসব ও দেখে এসেছে । বললাম যে হিমালয় বলে একটা বড় পাহাড় আছে । শুনে চোখ বড় বড় করে বলে ওঠে --ওট্টা দেকা হয়নি ! আমাদের জারুল পাহাড়ের থেকেও বড়

? তবে তাজমহল দেকেচি । এক রাজা ওটা নিজের ইস্ত্রির জন্য বানায় । ইস্ত্রি দিয়ে শুধু ইস্তিরি করতো না, সে তাকে কবর দিয়েছিলো । আরে ব্যাটা এই জন্যই তো দুনিয়া দেখতে বেড়োনো ! ইস্ত্রিকে এতটা সম্মান মনে হয় রাজাই দিতে পারে ।

জারুল হল ওদের এই এলাকার বড় পাহাড় । সেখানে রাতে হিম পরে আর ভোরে কুয়াশা ওড়না গ্রাস করে সমস্ত চূড়াগুলি । তার পাদদেশে নানান ক্ষেতখামার, বাগান আর খানিকটা দূরে নদনদী, মোহনা , সমুদ্র ।

মোহর-- ওর **মমতাজ বেগমের ইস্ত্রিতে মর্ফিং-টাকে** আর ব্যঙ্গ করেনি । বরং মজা পেয়েছে এমন একটি জিনিস দেখে ।

*****

রোহিনীর এই মেহেন্দিগড়কে ওরা বলে গুড়ি । মেহেন্দিগুড়ি । এই এলাকায় এক নতুন আন্দোলন শুরু করেছে, পরবর্ত্তী প্রজন্মের লোকেরা । ওরা অত্যাধুনিক । ধর্মীয় ভুলভাল নিষেধ মানেনা । কুসংস্কার নেই কোনো ওদের । কিন্তু সমাজ পরিবর্তন করা তো সহজ নয় ! অনেক ব্যাথা, বেদনা লুকিয়ে ওদের মনের গোপন কুঠুরীতে । শোষণ , অত্যাচার , মানুষে মানুষে বিবাদ থেকে যুদ্ধ আর হানাহানি থেকে

নিরীহ লোক ও পশুপক্ষীর অস্তিত্ব সংকট দেখে দেখে ওরা এই এলাকার জনগোষ্ঠীকে জাগ্রত করার চেষ্টা করছে ; মানব জাতিকে নির্মূল করে দেবার এক পন্থায় সায় দিয়ে ।

হাম দো হামারা নো ! এই হল ওদের স্লোগান । এই ধরিত্রী নাকি মানুষ বিহীন হলেই সুখী হবে । অন্যান্য প্রজাতির মানুষের মধ্যেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেবে ওরা । আপাততঃ মেহেন্দিগুড়িতেই শুরু হোক্ ! অনেকে নাকি সায়ও দিয়েছে । কিছু কাপেল্ নাকি সন্তানের জন্ম না দেবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ওদের সাথে । এই আন্দোলনের নাম ওরা দিয়েছে , **জন দুজ** । ওদের ভাষায় এর কোনো গভীর অর্থ আছে নিশ্চয় ।

যারা গভীরভাবে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে, তারাই তো সেই বস্তুটি পাবার জন্য, র‍্যাডিকাল হয়ে যায় । এরাও সেরকম । জনা পঞ্চাশ, যুবক ও যুবতীর দল । **জন দুজ আন্দোলনে নেমেছে ।** প্রাণবন্ত মানুষের, স্বপ্ন দুনিয়াকে মানুষমুক্ত করে ফেলার জন্যে ।

দরিদ্রদের ওপরে অত্যাচার , তাদেরকে অপমান করা , উগ্রপন্থা ও ধর্মীয় বিবাদ দেখে দেখে ওরা দুনিয়াকে মানুষহীন করে ফেলাই শ্রেয় মনে করেছে । অন্যরা সুখে থাকুক । পশুদের বন জঙ্গল কেড়ে আমরা ওদের

সর্বহারা করেছি । অসহায় শাবকেরা মায়ের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে সোজা সার্কাসে অথবা চিড়িয়াখানায় ।

এত অন্যায় দেখেও প্রকৃতি নীরব । তাই পৃথিবী থেকে মানুষ সরিয়ে দিলেই সবাই জব্দ হবে । তার জন্য দরিদ্র ও অত্যাচারিত মানুষকে, **নিজ হাতে নিজের বাচ্চাকে বলিতে চড়াতে হবে** । অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হবে । কেউ তো জোর করে ওগুলো করাতে পারবে না । আর তখন লোভী ও স্বার্থপর মানুষ শায়েস্তা হবে । আর মেজরিটি তো মধ্যবিত্ত ও গরীব লোক । ওরা সরে গেলেই অন্যগুলো নুইয়ে পড়বে ।

বুঝবে কত ধানে কত চাল । আর এটা এক বিপ্লব অথচ এতে কোনো রক্তক্ষয় অথবা মৃত্যু হবেনা । বংশ পরম্পরায় গরীব ও অপমানিত লোকেরা সরে যাবে জগৎ থেকে । প্রাকৃতিক উপায়েই ।

উদ্দেশ্য যাইহোক্ এই বিপ্লবকে সমর্থন করেনি মানুষ তাই অনেকেই ওদের দূর ছাই করেছে । মেহেন্দিগুড়িতে ওরা কিছুটা একঘরে হয়েই আছে । তবে আরো অনেকেই আছে যারা ওদের এই থিওরিকে সাপোর্ট করে সঙ্গ দিচ্ছে । এরা সাধারণত:আইনের চোখ রাঙানি দেখেনা কারণ ভারতের মতন জনবহুল দেশে, হয়ত

এই প্রথা কিছু স্বস্তি আনতে পারে -- মনে করে । অবশ্যি সঠিক কারণটা ওরা জানেনা ।

দিনে ওরা লুকিয়ে থাকে । বলে , আমরা সূর্যকে স্পর্শ করিনা । আর রাতে ওরা যমের মন্দিরে হানা দেয় । ফ্রিতে খাবার খাওয়ার জন্য । সেই খাবার ওদের সাপ্লাই করে যমের আদৃতা কন্যা, বৃদ্ধা রোহিনী !

রোহিনী , নিজের কাজের দিন থেকে যা আয় করেছে তাই দিয়ে ছেলে দুটিকে মানুষ করে দিয়েছে আর পরে বাকি সঞ্চয় যেমন ব্যাঙ্কে রেখেছে সেরকম নিজের স্বামীর নড়বড়ে বাড়িটি বিক্রি করে সেই টাকাও ব্যাঙ্কে রেখেছে । এখন এই যুবক ও যুবতীকে সেই টাকায় নিয়মিত খেতে দেয় । বলে, কী আন্দোলন করছে আমি বুঝিনা আর বোঝার চেষ্টাও করিনা । কচি কচি ছেলেপুলেগুলো খেতে পায়না তাই আমি ওদের রাতে একবারই খেতে দিই । দিনের বেলায় ওরা কোথায় থাকে আমি জানিনা । ওরা বলে যে ওরা বনে লুকিয়ে থাকে । কেউ কেউ গুহায় লুকিয়ে থাকে কারণ অনেকে ওদের ঢিল মারে । কাদা, মাটি লেপে দেয় । মেয়েদের অপমান করে । তাই ওরা বাইরে বার হয়না । কিন্তু রাতে আমি ওদের অন্ন সংস্থান করে দিই ।

তবে আমার বান্দর গিরিন, ওদের জন্য অনেক ফলমূল পেড়ে আনে শাখা-প্রশাখা থেকে । এমনিতে কেউ

খাবার খেতে কেন, প্রসাদ নিতেও এদিকপানে আসেনা। ভয় পেয়ে । কিন্তু এদেরকে যখন খাবার দিই ওরা খেয়ে নেয় । এই মূহুর্তে মৃত্যু ওদের চাইনা এটা জেনেও ।

রাতপরীর, জাদুদন্ডের স্পর্শে অলোকিত হয় রোহিনীর প্রাঙ্গন । তারপর রাতপোশক পরে খেতে বসে ওরা কয়জন । সারাদিন ছিলো অভুক্ত ! এবার থালা সাজিয়ে দিয়েছে অচেনা কেউ । যার সাথে কেবল মানবিকতার বন্ধনে বাঁধা ওরা । সামনে খাবারের উৎসব !

একদিকে ওদের সাথেই থালা নিয়ে বসেছে বান্দর গিরিন । শাখামৃগ পেড়ে এনেছে সুস্বাদু ফল নানান শাখা প্রশাখা থেকে । শাখায় শাখায় তাই আজ শাখা-অমৃত । নিঝুম রাতেও জেগে ওঠে প্রাণভোমরা । এই নির্জন বনরেখায় , পরিত্যক্ত যমালয়েও জীবন্ত হয় মানুষ । ময়ূখমালীর কিরণস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েও ।

মোহর আসলে ঐ গিরিন নাম শুনে ভেবেছিলো যে ওকে গিরিন বলছে , হয়ত ওর নাম গ্রীণ । কারণ রোহিনী তো আবার দুনিয়া দেখে এসেছে তাই কিঞ্চিৎ ইংলিশ শব্দ জানে । কাজেই হয়ত ওর নাম গ্রীণ । কিন্তু ওকে একবার গ্রীণ বলে ডেকে ফেলায় বুড়ি হকচকিয়ে

যায় । বলে , ওকে গ্রীণ বলছিস্ কেন ? ও তো গিরিন । এখানে ইলেক্ট্রি নেই । রাতে ওরা যখন খেতে বসে আমি লন্ঠন জ্বেলে দিই । সেই তেলও যোগাড় করে আনে গিরিন তবে ও আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায় আর তেল কিনে আনে । ওর নাম গিরিন । গ্রীণ নয় । (বুড়ি ইলেকট্রিক্ কে ইলেক্ট্রি বলে)

বিল্পবীদের জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠা এই বৃদ্ধার, হয়ত আদি অনন্তকাল থেকে মানুষকে লালনপালন করার অভ্যাস আছে। তাই অনাহুত কেউ হলেও- সে বাড়িয়ে দেয় স্নেহের পরশ । বদলে কিছু পাবেনা জেনেও ।

জন দুজের কর্মীরা অবশ্যই রোহিনীকে খুব শ্রদ্ধা করে । কোলে তুলে নাচে । তবে সবই ধরিত্রী- সাঁঝের পরশ পাবার পর ; লন্ঠণ জ্বেলে ।

এরকম কত শত বিপ্লব, আজ মনুষ্য প্রজাতিকে এই জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে আবার আরেক বিপ্লব ধ্বনিত হচ্ছে কিছু নব কোরকের বুকে- যা সেই মানব সমাজকেই ধ্বসিয়ে দিতে পারে, এক বিন্দু রক্ত না ঝরিয়ে । এ যেন নেতাজীর বলা কথাই অন্য আকারে ফিরে এসেছে ।

--গিভ্ মি ইওর স্পার্ম , আই উইল গিভ্ ইউ ফ্রিডম্ ফ্রম অল সাফারিং-স্ ।

মোহরের মনে হল যে যম কেবল ফিজিক্যাল বডির মৃত্যু দেবতা নন । উনি, যে কোনো নুইয়ে পড়া , ভেঙে পড়া তত্ত্ব ও জীবন দর্শনকেও মরণের স্পর্শ দিতে সক্ষম । আর সেটা কেবল দুনিয়া দেখা রোহিনী বুড়িই বুঝেছে ।**তাই সে নিত্য যম পূজায় ব্রতী হয়েছে । অজান্তেই ;জনদুজের আন্দোলনে শক্তি সঞ্চয় করতে ।**

এরকম কতনা মানুষ ছড়িয়ে আছে মেহেন্দিগড় থুরি গুড়ির পথঘাটে । বনে, বাগানে । আর এদের কথা ভেবেই, মোহর নিজের পাশা উল্টে দিয়েছে- পরে । এইসব কাহিনী , এইসব কথামালা , এইসমস্ত কথাকলি ; **মেহেন্দির মতন লেগে আছে ওর অলৌকিক হাতে ।** অপূর্ব সেই কারুকার্য । তাই এই ঘন বাদামি কিংবা লালচে আলপনাকে ও মুছে ফেলতে চায়না । থাক্না নিজের আঙিনায়, এইসব চেতনাগুলি !

নিজের নিজের বাসায়, নীড়ে, একান্ত আপনঘরে--- হাইটেক্-লগ্ন ভ্রষ্ট (ভ্রষ্টা) হয়েই ।

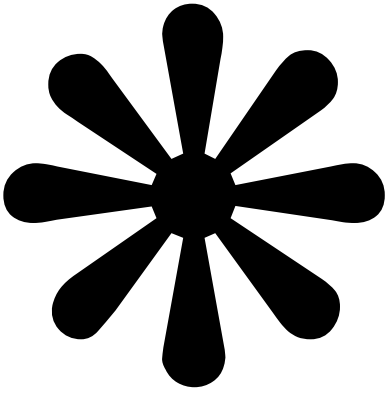

লিলিপিলি

লিলিপিলি এক মহিলা, যার দুটো পা-ই আছে তবু সে হুইল চেয়ারে যাতায়াত করে । কারণ সে অসম্ভব গরীব হয়ে গেছে এখন । পয়সা নেই । তাই কোথাও যেতে হলে হুইল চেয়ারে চড়ে যায় । সাইকেল চালাতে পারেনা ।

ও এক আজব মহিলা । একাই থাকে এক বাসায় । বাড়িটা একটু উঁচু । নিচে ওর কিছু পোষ্য থাকে যাদের দুধ বিক্রি করে ও কিছু আমদানী করে ।

একটা সিঁড়ি আছে, নড়বড়ে । সেটা বেয়ে উঠে যায় ওর ঘরে । হুইল চেয়ার চালিয়ে আসে । তারপর সেটা কোণায় রেখে সিঁড়ি দিয়ে ঘরে উঠে যায় । একমাত্র মেয়ে বিয়ে করে চলে গেছে অন্যত্র । স্বামী নেই । অন্য বৌয়ের কাছে থাকে । মেয়ে মাঝে মাঝে আসে ।

লিলিপিলি আবার আগে নিজের ব্যবসা চালাতো ।

সেখানে মোটামুটি আয় হতো । বয়সে অনেক ছোট এক ছেলেকে বিয়ে করে । পরে মেয়ে হয় । সেই কমবয়সী স্বামী, ওকে ত্যাগ করে যায় একসময় । এই বিয়ের কারণে ওর ব্যবসাও কমে যায়- কারণ ওকে এলাকার বাইরে, অনেক দূরে ঘর নিয়ে থাকতে হয় । লোকলজ্জার ভয়ে । ওর দোকান থেকে ও অনেক দূরে থাকায়, লাভক্ষতির হিসেবে বড় ধাক্কা আসে ।

ও আসলে এই অঞ্চলে জন্মানো- এক জাতের গাছের কান্ড কেটে নিয়ে, তার থেকে বেয়ে পড়া সাদা আঁঠা , বাজারে বিক্রি করতো । অনেকদিন ধরেই এখানে এসব চলেছে । কিন্তু সম্প্রতি বাজারে নকল আঁঠা এসে পড়ায় কেউ আর ওর কাছে আসতো না ।

আগে মেহেন্দিগড়ে নাকি, এইসব আঁঠা দিয়ে মৃত মানুষের দেহের সাথে ; তাদের পছন্দের খাবার আটকে দেওয়া হতো । কিন্তু বর্তমানে লোকে এইসব আঁঠার আর কদর করেনা । সস্তা হলেও, লোকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাই লিলিপিলি এখন গরীব । হুইল চেয়ারে করে যাতায়াত করে মেয়ের কাছে, কিংবা হাটে বাজারে । হুইল চেয়ারটি ওর কাছে **ঈশ্বরত্ব** পেয়েছে । ওকে

ধোয়, পোছে এমন কি লাগ্‌ড়া বলে একটি পুজো হয় ওদের- আমাদের বিশ্বকর্মা পুজোর মতন । সেই পুজোতে ও নিজের হুইল চেয়ারকে রীতিমতন মন্ত্র জপে পুজো করে ।

ওর এই প্রাকৃতিক আঁঠা , যার নাম লেঠেল- সেই বস্তুটি বাজারে আর না চললেও লিলিপিলি নিজে বন থেকে ঐ জিনিস সংগ্রহ করে আনে আর নিজের একটা করে চুল প্রতি পুজোতে, হুইল চেয়ারের গায়ে আটকে দেয় । কৃতজ্ঞতা স্বরূপ । কারণ এই বাহন না থাকলে ও বিপদে পড়তো তাই । বলে , আমি সেঁটে গেছি এর সাথে । হয়ত আমার মেয়েকে বলে যাবো যে --আমার

মরণের পরে যেন এই বাহন, আমার দেহের সাথে লাগিয়ে দেয় ঐ লেঠেল দিয়ে । আর আমি স্বপ্নেও ওকে নিয়ে যাবো । সেখানে কী হয় তো জানিনা । হয়ত ওখানে দেবতারা থাকে বলে গাড়ি ঘোড়ার অনেক ভাড়া যা আমি দিতে পারবো না !

লিলিপিলি যখের ধনের মতন এই হুইল চেয়ারটি আঁকড়ে থাকে । মানুষ যেমন স্কুটার বা মোটর সাইকেলকে যত্ন করে , মোছে , টিপ্‌টপ্‌ রাখে ও সেরকম এই জাদু কেদারা নিয়ে মাতামাতি করে ।

এটা এক মৃত, পঙ্গু ব্যাক্তির । কেউ ফেলে দিয়েছিলো ওদের বাসার কাছে । **কুড়িয়ে পাওয়া চেয়ার এখন মাধুরী ঝরায় । মাধবীলতার মতন জড়িয়ে আছে লিলিপিলির সমস্ত চেতনা, এই ম্যাজিক্যাল হুইল চেয়ার । আদি অনন্তকাল ধরেই ।**

তাশা

পেয়ারার মতন এক জাতের ফল হল তাশা । এখানেই পাওয়া যায় , বাইরেটা লেবুপাতার মতন রং আর অন্দরে লালে লাল ! মিঠে স্বাদ আবার কটূ গন্ধ । অদ্ভুত এক বিপরীত সাঁকো যেন, ফলের মধ্যে।

এই ফল কেবল সাঁঝের বেলায় বিক্রি হয়, মেহেন্দিগুড়িতে । বিকেলে নৌকো বেয়ে- ডাশা ডাশা তাশা নিয়ে লোকেরা নদনদীতে ঝাঁপ দেয় মোহর কুড়ানোর আশায় । প্রতিটি সন্ধ্যায় এখানে তাশা বিক্রি হয় । কেউ কেউ এক এক সাঁঝে, প্রায় হাজার পাঁচেক টাকাও পেয়ে যায়, কপাল ভালো হলে । শহর থেকে অনেকে তাশা নিতে আসে । দোকানীরা ; হোলসেল বাজার হিসেবে এখানেই আসে । কারণ সুস্বাদু তাশা

তাও সারবিহীন ফলানো -একমাত্র এই জায়গাতেই মেলে । ফলের রঙ দেখলে বোঝা যায় । টিয়াপাখির মতন, নৌকোর ওপরে ভাসমান তাশার চুবড়ি । সবুজ সবুজ শরীর আর কুসুমটা গাঢ় লাল । অর্ধেক খাওয়া অথবা কেটে রাখা জায়গা থেকে টিয়াপাখির রক্তিম ঠোঁট উঁকি মারছে !

তাশা ব্যবসাদার তিয়াসা , এই ভাসমান বাজারে নিত্যদিন ফল বেচতে গেলেও দিনের বেলায় এক জায়গায় একটি সরু দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে গলে যাবার চেষ্টা করে । একটি ভাঙা পাথরের বাড়ি আছে । অনেকে বলে যে সেই বাড়ি ওদের কোনো রাজার- যে পলাতক ছিলো । তার মহিষীর এক মহল আজ ধ্বংস স্তূপ । সেই পলাতকার মহলে কোনো দালান ছিলো যেখানে কোনো দেবীর আসন ছিলো । সেই দেবী আজ নেই । সোনার মূর্তি গায়েব করে দেওয়া হয়েছে । আছে কেবল গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দুটি হাল্কা দেওয়াল । মাঝারি হাইটের । লোককথা অনুসারে সেই দেওয়ালের মধ্য দিয়ে গলে গেলে অসম্ভব ভালো সব জিনিস হতে পারে । অবিশ্বাস্য সমস্ত জিনিস হয়েছে বহুকাল ধরেই তাই আজ দেবী প্রতিমা অথবা রাজমহিষী না থাকলেও সংস্কার রয়েই গেছে । যেমন রাবণের পুষ্পক রথের বিমানবন্দর নাকি আজও আছে সেরকম । এই দুই দেওয়াল, যার মধ্যে ফাঁক খুবই কম--নিত্য নতুন

মানুষ দ্যাখে, যারা নিজেদেরকে ওদের হাতে তুলে দেয় ভাগ্যের আশায় । এই পন্থাকে বলা হয় , পূজারা করা । সবাই করে । কেউ জেতে, কেউ হারে । তবুও নিয়ম করে পূজা নয়, পূজারা করেই চলে ।

তাশা ব্যবসাদারদের অনেকেই, নৌকো বেয়ে বাজারে নামার আগে- ঐ দুই দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে গলে যাবার চেষ্টা করে । তিয়াসাও ব্যতিক্রম নয় ।

তবে তফাৎ হল এই যে, অন্য অনেকেই গলে যেতে না পারলেও বাজারে ভাসে কিন্তু তিয়াসা যদি আটকে যায় কারণ দুই দেওয়ালের মাঝের ফাঁক খুবই কম , তাহলে সেদিন সে বিক্রি করার কোনো চেষ্টাই করেনা ।

অনেক বুঝিয়েও কোনো লাভ হয়না । মোহরের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে । তিয়াসা সেদিন জলে ভাসবেই না ! বিকিকিনি তো দূরে, সে নদীপাড়েই যাবেনা !

অথচ সে মূর্খ নয় । তার ফার্ম-ম্যানেজমেন্টে রীতিমতন, একখানা হেভিওয়েট ডিগ্রী আছে ।

তবুও মানুষ বদলায় না । কারণ স্বভাব বোধহয়, একমাত্র অভাবই বদলাতে পারে । অন্য কিছু নয় । অন্যসময় হয়ত ; স্বভাব বদলানোই সবথেকে শক্ত । অভাবে পড়ে লোকে সাধু থেকে ঠগ্ হয়ে যায় কিন্তু

জীবনে কোনো ঢেউ না এলে, মনে হয় একই স্বভাবকে আঁকড়ে থাকতেই লোকে পছন্দ করে ।

মোহরের সাথে এই শিক্ষিত , মার্জিত ওস্ত্রাপ্রানওর মেয়ের বেশ ভাব হয়ে যায় । তবুও কিছু কিছু সৎ পরামর্শ সে মানেনা ।

সব্রি

শবরীকে, মনে হয় সব্রি বলে এরা- কে জানে ! মোহরের তাই মনে হয় । সব্রি ,একজন মধ্যবয়সী মহিলা । দেখতে অনেকটা চীনা মেয়েদের মতন । হলুদ রং , চাপা নাক ও ক্ষুদে চোখ আর কোমড়ের নিচের অংশ একটু কম হাইটের ।

এই মহিলা, নিজের কাজ নিয়েই মশগুল । সারাটাদিন একটি হাউজবোটে থাকে । এখানে অনেক হাউজবোট চলাচল করে । আগে রাজারা নিজেদের বিলাসের জন্য অথবা জিনিসপত্র , মশলাপাতি আদান প্রদানের জন্য এগুলো কিনে ব্যবহার করতো । পরে লোকাল ব্যবসাদারেরা ওগুলো কিনে নিয়ে ফেরিঘাট থেকে চালানো শুরু করে । অনেক বিদেশী ট্যুরিস্ট এতে চড়ে ঘোরে । কেউ কেউ লং ট্যুরে যায় । কেউবা হোটেলের মতন রাত কাটায় । এগুলো দেখলে মনে হবে এক একটি প্রকান্ড অট্টালিকা ! রাজস্থানের বড়

বড় প্রাসাদগুলো যেমন সেরকম । কাঠের বোট ; তবে আধুনিক সব ব্যবস্থা রয়েছে । এইরকম এক বোটের মালিক সব্রি । **সব্রি ড্যাবড্যাবে** ওর পুরো নাম ।

মহিলার কেউ নেই । যথেষ্ট পয়সা কামায় বোট থেকে । ভোরবেলা, সূর্য ওঠার পরেই প্রাতরাশে ভড়ম্ খেয়ে বোটে চলে যায়।**অনেক রাতে, বোট নোঙর করলে , ঘরে ফেরে ক্লান্ত বিহঙ্গ !**

ভড়ম্ হল এক আজব খাবার ।

মূলো অথবা বাঁধাকফি বা চিচিঙ্গা খুব সরু করে কুচিয়ে নিয়ে ডাল দিয়ে একধরণের খিচুরি তৈরি করা হয় । তার সাথে থাকে ব্যসনের বড়া বা পেঁয়াজি ।

অনেক সময় বেগুনি আর শিম ভাজাও থাকে । এগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেয়ে নেয়ে সব্রি ।

পেট ভরা খানা খায় । লিকার চা সহযোগে । চা মানে অবশ্যই গজ ! তিন ফুটে এক গজ । এত ফোটায় যে মোহরের মনে হয় - এটা চা আর পানীয় থাকেনা বরং বিষ হয়ে যায় । তেতো প্লাস অখাদ্য । তবুও সব্রি নিয়মিত এই চা--ই খেয়ে খুশি ।

--আমি লিকার চা খাই । এটা নাহলে আমার চলেনা ।

মহিলা কারো সাথে কথা বলেনা । কারো সাথেই না । লোকজন , পড়শী কিংবা নৌকোর অতিথি তো নয়ই এমন কি চাকর বাকরের সাথেও না ।

হাতের ঈশারায় বাক্যালাপ হয় । যেমন বোবাদের সংবাদ পড়া হয় সেরকম করে মহিলা ইঙ্গিতে সব বোঝায় । একটু একাকীত্ব পছন্দ করে ।

কোনো বন্ধু নেই । আত্মীয় পরিজনকে দেখা যায়না ।

একজন বর নাকি ছিলো । সে অনেক আগেই পরপাড়ে পাড়ি দিয়েছে । অবশ্যি সে কোনো কামধান্দা করতো না । এই হাউজবোটের ব্যবসাটা আদতে, সব্রির বাবার । ও-ই একমাত্র সন্তান, তাই এই বিজনেস এখন সব্রিই চালায় । ও এর মালকিন । স্বামী গত হবার পরে আর বিয়েশাদি করেনি । বরং হাউজবোটে ডুব দিয়ে, হাউজ মানে সংসার হারাবার শোক ভুলেছে । একটি মৃত সন্তান হয় । তাকে নাকি বাড়িতেই কবর দেওয়া হয়েছে । সেই কবরের সামনে বসে, মাঝে মাঝে সব্রিকে অনেকে কাঁদতে দেখেছে । অর্থাৎ আবেগ তাকে ছেড়ে যায়নি । যা গিয়েছে তাহল বাক্যালাপের স্পৃহা ।

আর নীরবে যখন সব হয়ে যাচ্ছে তখন শব্দের কী প্রয়োজন ? সব্রি তো মৎস্যকন্যা , জলচর মানুষী ।

তার জল আর ঢেউ থাকলেই হল , শব্দ দিয়ে কী হবে ? ও তো আর লেখক/ কবি এইসব নয় ।

এই সব্রি-ই ; যে কারো সঙ্গেই মেশেনা , কথা বলেনা , সে একদিন মোহরকে নিজের বাসায় আমন্ত্রণ জানায় ।

হাত নেড়ে ডাকে । সুন্দর এক স্বর্ণালী সন্ধ্যায়, মোহর ওর বাসায় গেলে- তাকে অন্দরে নিয়ে যায় ।

বিরাট গোল টেবিলে, চিকেন রোস্ট সাজানো । দেশী মূর্গী মনে হয় । পাশে অজস্র তাশা ফল আর অন্যান্য । বিশেষ মিষ্টির ডিশ্ , ক্ষীর দিয়ে তৈরী যা সব্রি নিজে হাতে করেছে । সব সাজিয়ে গেছে এক আদিম মেয়েমানুষ ।

--আপনি রান্না করতে পারেন ? অসর্তক মূহুর্তে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, এই আজব প্রশ্ন ! কৌতুহল বেশিক্ষণ চেপে রাখা যায়না । ভেবেছিলো মহিলা ক্ষেপে উঠবে । কিন্তু নাহ্ ! মিষ্টি গলায় বলে ওঠে , মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, তখন রান্না পারিনা এটা বলা লজ্জার ব্যাপার । যতই বাইরে বাইরে কাজ করিনা কেন, গৃহস্থের টুকিটাকিও শিখতে হয়েছে । **নাহলে ইটের কাঠের দালানটা ঘর হয়না ।** আমার স্বামী খেতে খুব ভালোবাসতো । আর আমার হাতের খাবারই সবচেয়ে প্রিয় ছিলো তার । সব ঠিকই ছিলো জানো

কিন্তু মৃত সন্তান জন্মানোর পরে সব কেমন বদলে গেলো । চিকিৎসক জানালো যে আমাদের ঘর আর আলোড়িত হবেনা, শিশুর স্পন্দনে । তখনই বাথিয়া সাহেব বদলে গেলো । (বাথিয়া ওর বরের নাম)

বাথিয়া, শোক ভুলতে ধর্ম পরিবর্তন করলো যা আমি সমর্থন করিনি । ও বললো যে অন্য দেবদেবীরা ওকে কৃপা করবে । কিন্তু সেরকম হবার নয় । শরীর ব্যাগড়া দিলে আর কে কী করবে ? এরপরে ও সারা ভারতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো । একদিন খবর এলো যে ও মারা গেছে । হাঁপানির ব্যামো ছিলো তাই খুব শীতে গিয়ে পড়ায় আর বাঁচতে পারেনি । কাজেও মন ছিলো না কারণ ওর ভাবনাটা এইরকম ছিলো যে কাজ করে কী হবে ? কে আছে আমার ? কাকে দিয়ে যাবো সবকিছু ? আর বৌ তো নিজেই কাজ করে । স্বাবলম্বী । কাজেই তার আর গাধার খাটনি খেটে কী হবে ?

শেষ সময়ে এক বন্ধুর সাথে পদব্রজে ঘুরতে যায় হিমাচলে । ওখানে দেহ রাখে । মানুষটা এমনি ভালই ছিলো । নিষ্ঠুর সমাজ ওকে নিয়ে, অনেক ফেয়্রি টেল্স্ রচনা করেছে । ওকে বারবণিতার কাছে পর্যন্ত নিয়ে গেছে, ওদের গল্পে । কিন্তু সত্যি কী জানো ? ও আমাকে ছেড়ে কোনোদিনই কোথাও যায়নি ।

আমি এই জন্য কথা বলিনা । আমি ওদের ঘৃণা করি । কী বলবো ? কাকে বলবো ? যাই বলিনা কেন ওরা তাই নিয়ে জলঘোলা করবে আর নিজেদের মতন করে প্রচার করবে । তাই আমি শুধু কাজ করি । কথার খেলায় ভাসি না । কাজের ভেলায় ভেসে যাই-- দূর দূরান্তে ।

এতসব মানুষদের দেখে দেখে মোহর বুঝেছে যে এদের ভিটেমাটি কেড়ে নেবার ক্ষমতা বা অধিকার তাকে কেউ দেয়নি । দিতে পারেনা । একেবারে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলে দিলে আর কোথায় যাবে হতভাগারা ? বরং ধনীরা অন্যত্র যাক ! কত তো সাগর নদী আছে আরো ! সেখানে গিয়ে ডুব দিয়ে মুক্তো খুঁজে ফিরুক অসংখ্য ঝিনুক থেকে । **অক্টোপাসের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হোক্ ;তার আট বাহুর অবিনশ্বর হাগ্ নিতে নিতে ডুবে যাক বিলিতি মদে । তবে তাই হোক্ । তাতেই অমঙ্গলে মঙ্গল ।**

বনিকাপু

বনিকাপুড় নন, এ হল বনিকাপু । এর কাজ সারাটা দিন নদীতে ভেসে বেড়ানো । ভোর বেলা থেকে প্রায় বিকেল অবধি সে নদীতে ভাসে । কাপের মতন একটি ডিঙি নৌকো চেপে । সেই নৌকো তার নিজস্ব । নিজের তৈরি । গাছের মরা গুঁড়ি কেটে নিয়ে, কাপ আকারের এই ডিঙি বানিয়েছে । তাতে চড়ে সে ভেসে বেড়ায় নদনদী । দুই চোখ ভরে দেখে হাউজবোটগুলো । ওর স্বপ্ন ; এমন এক বোটের মালিক হওয়া ।

মোহরকে বলেছে , দিদি , কোনদিন কি কিনতে পারবো ? (অনেকে দিদি /জিজি বলে, ওদের ভাষায় সেটাই)

নোনা জল সম্পর্কে সব জানে । সমুদ্রের অসম্ভব নোনাজল আর নদীর মিষ্টি জলের মাঝে যে অর্ধ নোনা জল- তার সম্বন্ধে সে সব জানে । নুনের সাথে সখ্যতা তার, কাজেই জানবে না ? মোহরকে শুধায় , দিদি তোমরা মাছের কথা জানো । ডলফিন্ আছে শুনেছো ।

অনেক অনেক সামুদ্রিক জীবের গল্প শুনেছো । কিন্তু সাগরের উকুন হয় জানো ?

ও নাকি দেখেছে । বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের গায়ে ওরা বসবাস করে । ওদের **sea lice** বলে ।মোহর শুনে অবাক হয় কারণ ছেলেটি মূর্খ , প্রথমটা বিশ্বাস হয়নি । পরে জানতে পারে যে সত্যি এমন জীবও আছে এই বিচিত্র দুনিয়ায় ।

এই যুবক সারাটাদিন, ওর স্বপ্নের বুকে ভেসে বেড়ায় । যদি একটি হাউজবোট জুটে যায় । মোহরকে, সব্রির বাড়ি নিমন্ত্রিত হতে দেখে একবার বলেও ফেলে , দিদি উনি কি কোনো বোট ভাড়া দেবেন ? বা বিক্রি করবেন ? কম লোনে দিলে আর কম-সম সুদে, আমি হয়ত কিনেও ফেলতে পারি । জানো দিদি, এই বোট পুরো দড়ি দিয়ে বাঁধা ! কোনো পেরেক ব্যবহার করা হয়না, এই নৌকো বানানোর সময় !

****

বনিকাপু ; যাকে লোকে **কাপ্পু** বলে ডাকে সে রাতে কাজ করে । এলাকার অনেকের বাড়িতে পাহারা দেয় । যারা বাইরে কাজে যায় কিংবা অনেকে বুড়োবুড়ির জন্য লোক নিয়োগ করে ; রাতের বেলায় শুয়ে থাকার জন্য তাদের বাসায়- আর সেইসব কাজে লেগে পড়ে কাপ্পু ।

মাস মাইনে পায় বোধহয় । ওখানেই শুয়ে থাকে । সচরাচর কোনো সমস্যা হয়না । তবে একবার কে যেন সবুজ নারকেল বন ভেদ করে, পরিত্রাহি চীৎকার করে উঠেছিলো । গভীর রাতে । লোকে ভাবে কেউ বুঝি বড়সড় বিপদে পড়েছে । কিন্তু পরে অনুসন্ধান করে বার হয় যে সেটা কারো বাড়ির বিচিত্র এক ডোরবেল । সেই বেলের কানেকশান মনে হয় গোলমাল করছিলো আর সেজন্য ক্রমাগত বেজে চলেছিলো বেলটি । পাড়া কাঁপিয়ে বেজে ওঠা, ঐ চমৎকারী বেল মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো । কিন্তু আর কোনদিন কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি । কাপ্পু রাতে ভালই ঘুম দেয়, অন্যের গৃহে । নিজের বাড়ি নেই । বাপের ভিটে ছিলো । ছোট্ট কুটির । সেই বাদামী , খয়েরি আর লাল দিয়ে আঁকা মধুর ভান্ডার- কিন্তু সেই বাড়ি কাপ্পু বেচে দিয়েছে । ব্যাঙ্কে কিছু জমেছে । আর মাইনে থেকে জমা করছে । কারণ তাকে একটি হাউজবোট কিনতেই হবে । সে বিয়েও করবে না । করতে পারে যদি বৌ, যৌতুক হিসেবে একটি হাউজবোট আনে !

খুব অল্প খায় । ভাত, ডাল , সবজি সেদ্ধ মাখে ঘি দিয়ে আর শেষপাতে খায় শুকনো মাছের ঝাল । এক এক দিন, এক এক মাছ নিয়ে আসে । সস্তায় পায়, নিজে সমুদ্রে ঘোরে বলে । কোনোদিন হয়ত তাশাও আনে । তবে খুবই পরিমিত পরিমানে আহার করে ।

খালি জমিয়ে যায় । একটি বড়সড় হাউজবোট না জোটাতে পারলে নাকি মরেও শান্তি পাবেনা । মৃত্যু ভয় আছে ,তাই যমের মন্দিরের দিকে মোটে যায়না কারণ এই মূহুর্তে ওর মরণে আপত্তি আছে । মরতে কেউ-ই চায়না তবে একখানি হাউজবোট পেয়ে গেলে হয়ত তখন ও মরতেও নিমরাজি হবেনা ।

মোহর অবশ্যি কাজের শেষে, ঐ স্থান থেকে পাকাপাকি ভাবে বিদায় নেবার সময় ওকে অনেক টাকা দান করে আসে । ওর অনেক টাকা আছে । আর কিছু অর্থ যদি এই তরতাজা যুবকের একটি স্বপ্নকে- বাস্তব করতে সক্ষম হয় তা হোক্ না ! মোহর পরে আরো উপার্জন করে নেবে ; একজন সফল ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম্ ম্যানেজার হিসেবে কিন্তু এই কটি টাকা যদি একজন মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করে , একজনের বহুদিনের দেখা একটা স্বপ্নকে- যা সে অতি কোমল মনে লালন পালন করেছে ; তাকে একটা কাঠামো দিয়ে মহল করে দিতে পারে তাহলে মন্দ কী ?

কাপ্পু তো ওকে দিদি বলে ! আর সেও তো ওর পার্থিব সখা , সমুদ্র চিনিয়েছে ওকে , ভিজিয়েছে নোনাজলে ---কত অজানা জিনিস ! আর ও এইটুকু দিতে পারবে না ? মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা ? যা দিয়ে একজন জীবন্ত হতে পারে ?

সুনেরি

সুনেরির বাস এই অঞ্চলেই । মেয়েটি জাতিতে ডোম । মড়া পোড়ানো কাজ ওর । আসলে ও নিজে করেনা এসব- কিন্তু ওর পরিবার করে । ওদের এই এলাকায় ডোমদের বাস অনেক দূরে, এক বনতলে । কিন্তু সুনেরি থাকে খাস নগরে । আসলে প্রতি সপ্তাহে ওকে একবার করে লাগে , ব্রাহ্মণদেরও । এখানে একটি উৎসব হয় । সেই উৎসব, কোনো রাজার সৃষ্ট এক মিলন মেলা । সেখানে ডোমের এক ফোঁটা রক্ত ব্যাতীত উৎসব এর অগ্নিশিখা জ্বালানো হয়না । এক ফোঁটা রক্ত, কুন্ডে ফেলে- তবেই আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হয় । প্রতি সপ্তাহে এই আয়োজন হলেই ওকে চাই মানুষের । ও যায় । বদলে উৎসব কমিটি ওকে দিয়ে নানান কাজ করিয়ে নেয় । থাকে ওদের দেওয়া এক ঘরে । ওর বাড়ির লোকেরা সকলে এককোণে ডোম, মেথরের বস্তিতে থাকে । মেয়েটির আগে ওর পূর্বজ কেউ এইসব কাজে নিযুক্ত ছিলো ।

পরে ও এসেছে । কিন্তু ওর পরে কে আসবে সেটা ও জানেনা কারণ ও বিয়ে করেনি । মাথায় বিরাট ফুলের মালা । খুব পুরু স্তরের মালা আর নাকে বিরাট একটা নাকছাবি পরা মেয়েটি কিন্তু একা থাকলেও, এক আজব জিনিসের কবলে প্রায় সব সময়ই পড়ে । ওকে নাকি ঘুমোনোর সময় অনেকবারই নদীর ঢেউ এর কাছে লোকে ফেলে দিয়ে আসে কারণ ও অচ্ছ্যুৎ , কিন্তু কোনো অজানা কারণে কোনোবারই মৃত্যু বরণ করেনা । জীবিত অবস্থায় হাসি মুখে ফিরে আসে নিজের ছোট্ট কুটিরে । নিকানো উঠোন , লাল রং এর ছাদে একটি হলুদ লতানো গাছ , ফুলে ফুলে ভরা । এই ঘরটি ওকে উৎসব কমিটি দিলেও ও পরিষ্কার করে রাখে- ও নিজের ঘর বলেই মনে করে । ভাড়া বাড়ি নয় ।

মেয়েটি সবসময় হাসছে । প্রতি সপ্তাহে, নিজেকে কেটে রক্তদান করে বটে কিন্তু ওকে নাকি স্থানীয় ব্লাড ব্যাঙ্ক নিরাশ করেছে । একবার ও গিয়েছিলো রক্ত দিতে, ফ্রিতে- কিন্তু ওরা ওর পরিচয় শুনে ওকে তাড়িয়ে দেয় । সুনেরি আবার অবসরে পাখি ধরে । বনের পাখি ধরতে ও ওস্তাদ । নীল পাখি , গাঢ় লাল পাখি , সবুজ ও হলুদ পাখি সবই ওর কোটরে ঢুকে পড়ে ।

লোকাল পাখি ব্যবসাদারেরা, ওকে দিয়ে পাখি ধরায় । তাদের বোধহয় জাতপাতে তেমন বিশ্বাস নেই ।

এক ব্যবসাদার নাকি আছে, ওর জানাশোনা । সে অবশ্যি পাখির ব্যবসা করেনা । অন্য কোনো কাজে জড়িত । কিন্তু সে বেশ ধনী । সুনেরি পাখি ধরে দিলে যখন পক্ষী কেনাবেচা করা মানুষেরা হাটে বসে তখন সে নাকি ওখানে গিয়ে কোনো না কোনো বিক্রেতার কাছ থেকে তার সমস্ত পাখিগুলি কিনে নেয় । তারপর খোলা আকাশে তাদের ছেড়ে দেয় । এরকম সে সবসময় করে । যদিও কষ্ট করে পাখিগুলো ধরে দেয় সুনেরি কিন্তু ওর নাকি এই জিনিসটা ভালোলাগে ।

বলে --- ওদের তো ছানাপোনারা বাসায় অপেক্ষা করে, মায়ের জন্য বলো ! ওদের মায়েরা বাসায় না ফিরলে, ওরা না খেয়ে মরে যায় ।

মোহর শুধায় --- তাহলে তুই ওদের জালে আটকাস্ কেন ?

সুনেরি চোখ গোল গোল করে বলে, ওমা ! এটাও বোঝোনা ? আমি পয়সা পাই তো !!!

সত্যি তো, পয়সার জন্য কী না করে মানুষ ! এই যেমন আজকাল বিস্কুট কিনতে গেলে কেবল বিস্কুট মেলা ভার । মাঝে মাঝে মনে হয় শাক-সবজি খাচ্ছি -

----বিস্কুটের মধ্যে এমন সমস্ত জিনিস ভরা । পালং, মেথি শাক , সর্ষে কী না দেয় ? বিস্কুটের অরিজিন্যালিটি হারিয়ে গেছে স্রেফ ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করার নেশায় । পয়সা অনেক কিছু বদলে দেয় । অনেক ভাবনা , ধারণা আর ইচ্ছা ।

মোহরের মনে হয় এই এলাকার মানুষগুলি অরিজিন্যাল ভাবে থাকুক । মানুষে ; সে পালং শাক আর কচু ডাঁটা মেশাতে পারবে না । মানুষগুলি নিজেদের অস্তিত্ব শুধু নয়--অরিজিন্যালিটি নিয়েই বেঁচে থাকুক । সব বিস্কুটকে, ফিউশান করার দরকার নেই । জগতে অরিজিন্যাল জিনিসেরও প্রয়োজন আছে । অনেক মানুষ আছে, যারা আকরিক জিনিস ভালোবাসে । মিশ্রণ কিংবা জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বস্তুর দিকে হাত না বাড়িয়ে, আর সেটা কেবল নানান দ্রব্যের ক্ষেত্রে সত্য নয়, মানুষের বাচ্চার ক্ষেত্রেও পরম সত্য । তাই মোহরের নেশা ও পেশার, পাশা উল্টে দিলো সে নিজেই । **স্রেফ পালং শাকের বিস্কুটের বদলে সত্যিকারের বিস্কুট খাবার লোভে ।**

নিম্মি

নিম্মিও আরেক মহিলা । লোকাল নারী । মধ্য বয়সী । তার কাজ ছিলো কোনো এক কারখানায় শ্রমের কাজ ।

সেই কারখানা ছেড়ে দিয়েছে সে প্রযুক্তি এগিয়ে গেছে বলে । কারণ এখন মোবাইল ফোনের যুগ । আন্তর্জালের যুগ । তাই মিডিয়া সবার হাতে আর সাথে সাথে ঘোরে । যেখানেই যাও নিজের ফেসবুক পেজ সাথেই যাবে । এরকম এক সময়ে নিম্মি নামক এই মহিলা কিছু পয়সা কামিয়ে নেবার এক প্রকল্পে যোগ দিয়েছে । দরিদ্র এই রমণী প্রতিটি পাই পয়সার হিসেব করে । করতেই হয় । দুটি সন্তানের জননী । স্বামী কাজ করতে অক্ষম । তার কোনো ব্যামো আছে । সবসময় চুপ করে বসে থাকে । ক্ষেতের ধারে অথবা কোনো সবুজ মাঠের পাশে সারাটাদিন একা বসে থাকে । টিফিন কৌটো করে খাবার নিয়ে যায় । গলা গলা ভাত আর মূলো কিংবা কলমি শাকের তরকারি ।

চাষীরা যখন সবজি ওদের ট্রাকে তোলে, তখন ঈষৎ নরম হয়ে যাওয়া কিংবা একটু ভাঙা বা বেঁকে একেবারে ডিফর্মড্ হয়ে যাওয়া কিছু মূলো ওরা ফেলে দেয় । সেগুলো নিয়ে আসে নিম্মির বর । আর অবাঞ্ছিত ঐসব শাক । সেগুলো খায়, রান্না করে । বাসায় বাচ্চাগুলোকে-কখনো দেখে । কিন্তু কাজ করেনা । কী যে তার অসুখ কেউ জানেনা কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে সবাই দেখেছে । একমনে বসে বসে হয় রোদ পোহায় অথবা গরমে, বিরাট গাছের ছায়ায় শীতল হয় । বর্ষায় ওকে, গোয়ালে বসতে দেখা যায় । কারো গোয়ালের ছাদের নীচে বসে থাকে ।

নিম্মির, ইদানিং বেশ মোটা আয়ের একটা পথ হয়েছে ।ওকে এক বিদেশী চ্যানেল কাজে নিযুক্ত করেছে । এই এলাকায় মানে মেহেন্দিগুড়িতে একটি বিরাট অরণ্য আছে । সেখানে নাকি এমন এমন সব জায়গা আছে, যেখানে বনবিভাগের লোকেরাও পা দিতে পারেনি এত গভীর সেইসব এলাকা । নিম্মি নাকি কোন সে জাদুবলে ঐসব অঞ্চলে পা দিতে পারে । ও নাকি সব চেনে । বলে --- ছোট থেকে বাবা আমাকে নিয়ে নিয়ে এইসব জায়গায় যেতো । অনেক ভেসজ , লতাপাতা চেনাতো । এমন এমন জায়গায় গেছি যা ভেজা , স্যাঁতস্যাঁতে । সূর্যের আলো পর্যন্ত যথেষ্ট ঢোকেনা । অনেকবার জংলী জানোয়ারের হুঙ্কার শুনেছি । ওরা

কাছে এগিয়ে আসছে মনে করে ভয় পেলে, বাবা বলতো যে ওদের হিংসা না দেখালে ওরা কিছু করেনা । সরু সরু ঝর্ণা আর জলপথ পার হয়ে কত পাহাড়ি এলাকায় উঠে গিয়েছি । সেইসব জায়গায় কেউ যায়না ।

একবার এক বুড়িকে দেখি, আগুন জ্বালিয়ে কী করছে । অনেকবার তারপর ওকে দেখেছি কিন্তু ও কে তা জানিনা বা বুঝতেও পারিনি । কোথার থেকে আসে তাও জানতে পারিনি । হয়ত আমাদের মতন সেও বনে বাদারে ঘুরে আনন্দ পায় । নানান প্রজাতির গাছ , আজব পাখি ও পোকামাকড়ের বাসভূমি ঐসব অঞ্চলে যেতে পারতাম বলেই আজ ওরা আমার কদর করছে । ওরা নাকি দেখাবে সবকিছু ; ওদের পর্দায় । সবাই দেখবে । আর আমি কটি পয়সা পেয়ে যাবো ।

আমার ভাগ্যে এই লেখা ছিলো । আজকাল অনেক সময় বরকেও সঙ্গে নিই । ও আবার আমার সাথে যায় কিন্তু বেশী দূরে যেতে পারেনা । তখন বাইরে বসে অপেক্ষা করতে থাকে । এইভাবে ওর সাথে এক বনবিড়ালের দোস্তি হয়েছে । সে নাকি ওকে ইদানিং সঙ্গ দেয় । ভাবছি ওকেও দেখাবো মোবাইলে । যাতে ওরা একেও পর্দায় তুলে ধরতে পারে । এই বিড়ালও বিরল প্রজাতির । আরো অনেক অনেক টাকা পেয়ে যাবো তাই না ?

সরল প্রশ্ন নিম্মির চোখে । ওর স্বামী, নীরব মানব আমরোহি (ওর নাম) ওর সঙ্গী হলেও তার কোনো চাহিদা নেই । না সে কিছু দাবী করে, না ওর আয়ে ভাগ বসায়- সঙ্গ দিয়েছে বলে । ও কেবল চুপ করে বসে থাকে আর ওকে ছায়ার মতন অনুসরণ করে ।

বহুদিন একত্রে বাস করলে নাকি বর ও বৌকেও এক রকম দেখতে লাগে । এদেরকে কিন্তু সেরকম লাগেনা । লোকটির কাজ চুপ করে বসে থাকা ।এত বসে বসেও কেউ যে বিরক্ত না হতে পারে, তা ওকে দেখে শিখতে হয় ।

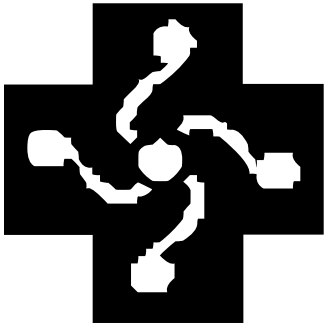

শাহারন

শাহারন ছিলো এক মাহুত । ছোট্ট পরিবার নিয়ে সে সুখী ছিলো । হাতীর দেখাশোনা করার সাথে সাথে সে নিজের বাচ্চাদেরও যত্ন করতো । তার বৌ মাধবী ছিলো ঘরকুনো । ঘরই তার জগৎ । খাবার বানানো, শিশুদের প্রতিপালন করা, উঠোন নিকানো আর বাসনপত্র ও কাপড়জামা ধোয়া ছিলো নিত্যকর্ম ।

শাহারন কিন্তু হিন্দু । নামটি অন্যরকম হলেও । মাধবীকে নিয়েই মানুষটি খুব সুখী ছিলো ।

এই এলাকায় হাতীদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হয়, মালবহনের জন্য অথবা মন্দিরে ধরে রাখার জন্য । সেখানে ওরা নানান ভক্তদের আশীর্বাদ করে থাকে আর সাধারণ মানুষকেও । মন্দির কমিটি পয়সা পায় । সেইসব হাতী আবার একজায়গা থেকে অন্যজায়গা যায়, ঘুরে ঘুরে ।

অনেক সময় তাদের লরি করে নিয়ে যাওয়া হয় । কখনো বা মালগাড়িতে । লরিতে তোলার কায়দাটি আজব । বড় একটা লোহার পাটাতন অনেকটা স্লিপের মতন, লরির সাথে আটকে দিয়ে ঐ হাতীকে ঠেলে ওপরে তুলে দেওয়া হয় । ও শিখে গেছে তাই নিজেই উঠে পড়ে পেছনের অংশটায় । লরি, ট্রাক কিংবা বিরাট কোনো ভেহিকেলে করে ওদের যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন অনেক সময়ই সঙ্গে মাহুতও যায় । কখনো সে থাকে হাতীর সাথে আবার কখনো বা চালকের কেবিনে বসে । একবার এক সুবিশাল হস্তীকে তোলার সময় সে বেকায়দায় পড়ে যায় মাটিতে । স্লিপের মতন লোহার সিঁড়িও উল্টে যায় । কিন্তু হাতীর দেহে পিষ্ট হয়ে মাহুত মানে শাহারন যে কিনা নিচেই দাঁড়িয়ে ছিলো, সে নিহত হয় । একদম হাতীর পায়ে পিষ্ট হবার মতন, দেহের তলায় হারিয়ে যায় শাহারনের নশ্বর দেহটা ।

সেই শুরু হল মাধবীর দু:খের জীবন । কটি কচি শিশুকে নিয়ে একদা ঘরকুনো মেয়েটি বাইরের জগতে পা দিলো । ঘোমটায় ঢাকা ছিলো তার মুখ । এখন সে মুখ খুলেই ঘোরে । হাতে থাকে লাঠি । তবে সে খুব সাবধানী । দেখে পা ফেলে । তার কারণ সে মরে গেলে বাচ্চাগুলো খাবে কী ? ওরা এখনো ছোট । ওদের মাধবী লেখাপড়া করাতে চায় । সরকারি ইস্কুলে

দিয়েছে । নিজে হাড়ভাঙা খাটনি খেটে ঘরে ফেরে আর ভোরের আলো ফোটার আগেই, উঠে গিয়ে খাবার বানিয়ে ফেলে । যাতে ওরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে । ওদের লেখাপড়া করাবেই করাবেই কারণ ওরা হাতীর লাইনে আসুক তা সে চায়না । বাপ্ ছিলো মাহুত । মা কপালের দোষে স্বামীহারা হয়ে হল সেই মাহুত তবে বাচ্চারা আর এসব করবে না । অহেতুক মরতে হবেনা ওদের । ওরা পরিপূর্ণ জীবন কাটাবে যদি লেখাপড়া শিখে নেয় । যতটাই শিখুক, তাতে কলম ধরতে পারবে আর হাতী পেটাতে হবেনা ।

মহিলা মাহুত মাধবী খুব আশাবাদী যে ওরা পারবেই । ---পারবে না দিদি ? বলো ? কী পারবে না ?

মোহর ওকে ভরসা দেয় । বলে , কেন পারবে না ?

--ওরা যদি হাতীর দিকে যায়ও তবে হাতী নিয়ে বই লিখবে । হাতীকে মারবে না , পিটবে না আর ওর রোষে কিংবা ওজন দোষেও পড়বে না মানে কুপোকাৎ হবেনা ।

মাধবী একদিন মোহরকে নেমতন্ন করেছিলো । বলেছিলো যে দিদি তুমি আসবে ? মোহর উত্তরে হেসে বলে , কেন আসবো না ?

--আমাদের বাসায় খাবে ?

--কেন খাবো না আমি ?

মহিলাটি নিজেকে বলে চিপ্‌স। **চিপিস্‌** হল ওর উচ্চারণ । কলা, আলু, মূলোর রসালো অংশ বাদ দিয়ে শুকনো করা হয়েছে- সেরকম জীবন ওর অস্তিত্ব থেকে শুষে নিয়েছে সমস্ত রস । ওকে দেখলে মনে হবে ওর সোনার বরণে (ও সত্যি ফর্সা) যেন মেঘের ছায়া পড়েছে, বাইরের জগতে পা দিয়ে কারণ ওকে এখন তামার মতন লাগে । তামার অক্ষরে লেখা এক গল্প , **রাত্রি রাজকন্যার, কালো ডানায় ।**

মোহর গিয়েছিলো সবুজ শাড়ি পরে । চুলে সাদা ফুল । একটি চন্দন কাঠের হাতী ওকে উপহার দেয় । ও বলে, আরে বাবা এত দামী জিনিস আমি কোথায় রাখি ? আর এটার ভেতর থেকে কি সুন্দর গন্ধ আসছে ! নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখে ওটা ভাঙা তাকে তুলে রাখে মাধবী । আবার বলে ওঠে , হাতীর ওরা কিছু বোঝেনা অথচ তাই বানায় । দেখো ওর শুঁড়টা কি এত ছোট আর পা গুলো এত বেঁটে হয় ?

আসলে এই হাতী হল- শৈল্পিক এক হাতী । বিমূর্ত হাতী । শিল্পীর চোখে ও চেতনায় বসবাস করা মিথিক্যাল এক পশু, যার পদচারণা হয়ত সুক্ষ্ম কোনো জগতে সম্ভব কিন্তু বাস্তবের জমিনে নয় । তাই হাতী বিশারদ, **মহিলা মাহুত মাধবী** ওকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে ।

কারণ মাধবীর সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে আছে- এক ঐশ্বরিক হাতী নয় জান্তব কেউ-- যার চাপে ও বিধবা হয়েছে , যে ছিলো ওদের আয়ের পথ আর এখনো সেরকম আছে কিন্তু একই সঙ্গে মাধবীকে এই জন্তু সাবধানী করেছে । তাই টপ্ টু বটম হাতীর খেলায় মাতলেও তার **পাশবিক** মাধবীকে সতর্ক করেছে । মাধবী জানে, যে গড়ে সে ভাঙে আবার যে ভাঙে সে গড়ে দিতেও জানে -ঠিক ওর পোষা ঐ হাতীটির মতন । স্বামীর মরণের পরে লোকে অন্য মাহুত খুঁজেছিলো কিন্তু ও নিজে গিয়ে দায়িত্ব নিয়েছে । বলেছে, আমি সব শিখে নেবো । এমনকি ওদের বশ করার মন্ত্র ও সমধুর গানও । আমার মরদ পেরেছিলো আর আমি পারবো না ? এতদিন ঘরে ছিলাম কারণ বাইরে আসার প্রয়োজন ছিলো না । কিন্তু এখন আসতে হয়েছে, কপালের দোষে । আর যখন পা দিয়েই ফেলেছি তখন ঝি বা আয়া না হয়ে, হাতীই হবে আমার আয়ের উৎস । আর এটা তো দূর্ঘটনা । ও তো আর আমার বরকে পিষে মারেনি ; কোনো বিশেষ কারণে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে !!!

এই হাতীটি, যখন বনপথে লরি থামিয়ে খাবার খায়, ওটার ডিকি থেকে তুলে নিয়ে তখন নিজের একটা বাচ্চার মতনই, ওকে নিষেধ করে থাকে মাধবী আর মজার ব্যাপার হল এত্তো বড় জীবটি তা শোনেও !

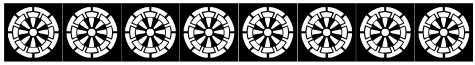

মোহরের পাশা উল্টে দেওয়াতে, ওর সংস্থা যাই মনে করুক না কেন, তাতে সবার একপ্রকার লাভই হয়েছে । নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে আর এইসব মেঠোপথের লোকগুলো বেঁচে গেছে- হঠাৎ গৃহহীন হয়ে, চালচুলোহীন অবস্থায়, নতুন আলোর সন্ধান করতে না যাবার কারণে ।

মোহর- যদিও ক্রিয়েটিভ পর্যটনের বিরুদ্ধে নয় তবুও সে শিকড় থেকে গাছকে উপড়ে ফেলার বিপক্ষে । হোক্ না এমন উন্নয়ন আর পর্যটন যা মানুষকে পথ দেখায় । নতুন কর্ম সংস্থানের সাথে সাথে, মানুষকে গৃহহীন না করে সূর্যের কিরণ দেখায় । কখনো শারদপ্রাতে কখনো বা রং-চং মাখা রাখী পূর্ণিমায় ।

মোহর এখন ভালো আছে । শান্তিতে আছে । আর আইনস্টাইনের বাড়ি দেখতে যাবার প্ল্যান করছে । তবে কিছু মাইনে দান করেছে হাউজবোট কেনার জন্য- তাই একটু সময় লাগবে সেখানে পৌঁছাতে । কারণ ও দুই হাত ভরে টাকা নিয়েই, পরবাসে যেতে চায় । খুব এনজয় করবে আর **অংকের ফাগুনে ডুবে যাবে ; অ্যালবার্টের শাখাপ্রশাখায়** । ওর মনে হয়

আইনস্টাইনের মুখটা হল জগতে দেখা সবচেয়ে শুদ্ধ আর সুন্দর মুখ ।

আরেকটি গ্রাম আছে দুনিয়ায়, যেখানে সবকিছু বোমা দিয়ে তৈরি । বহু বছর ধরে লাগাতার যুদ্ধ চলায়, ঐ এলাকায় এখন এত বোমা আর সেই সংক্রান্ত জিনিস জমা হয়েছে গেছে- যে স্থানীয় মানুষেরা সবাই এইসব বোমা ও তাদের ভাঙা অংশ দিয়ে নৌকো , গাড়ি, বাড়ি এমনকি স্কুলও বানিয়ে ফেলেছে । খুবই ক্রিয়েটিভ তাই না ? জটায়ুর পরের উপন্যাস, **বোমার বুননে !!!**

ধ্বংসের কথা মনে না রেখে ; ভয়াবহ স্মৃতিগুলো মুছে ফেলে- এগিয়ে চলেছে এই গ্রামীণ মানুষগুলো নতুন দিনের খোঁজে--- ফেটে যাওয়া , নিঃস্ব , নির্ভেজাল বোমার হাত ধরেই ।

মোহর দেখবে আর অনুভব করবে - ভাঙাগড়ার নামই জীবন । কখনো শকুনির পাশায় ভাঙে তো মোহর বঙ্গীর পাশায় গড়ে ওঠে । একই ভুবন , মিঠে- তেতো অবিনশ্বর, এই কম্পিত জীবন ।।।

The End